Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 139 - 151
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 139 - 151
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালীন রক্তাক্ত জীবন ও বহুভুজ সংকট : তিনটি উপন্যাসের আলোকে

মোরশেদুল আলম
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
এবং
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
উনাহত-সিংড়া কলেজ, বগুড়া, বাংলাদেশ
Email ID: malam2031973@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Bangladesh, Post-war Period, Glorious, Novels, Consciousness, Syed Shamsul Haque, Shahidul Zahir, Imdadul Haque Milan, Humiliation, Contextual.

Abstract

Despite the overall commitment to the bloody sentimentality of the war-torn period that lives on; The glorious uniqueness of Bangladesh's liberation war novels lies in the endless variety of creative efforts of dynamic consciousness, which is intermingled with an underlying optimism despite the hundred failures, sacrifices and blood-stained memories. It is for this reason that the evocative novels of Bangladesh's liberation war are marked as an aesthetic document in the genre of Bengali literature. Many enlightened and unenlightened and inevitable aspects of Bangladesh's liberation struggle and post-independence period have been carved in these novels. It can be said that they have created an integral consciousness of the bloody liberation war of Bangladesh, especially the post-war period, society and life course through the piecemeal creation of national consciousness in their novels. Novelists Syed Shamsul Haque (1935-2016), Shahidul Zahir (1953-2008) and Imdadul Haque Milan (b. 1955) who have made the entire consciousness of the Bengali nation artistic in Bengali fiction after the liberation war.

During the Bangladesh War of Independence, on one hand, Bengalis depicted the collective agony, outcry, and the tormented images of the ravaged times with exceptional artistic skill, while on the other hand, they portrayed the boundless heroism of the freedom fighters, the astonishing courage and unwavering patriotism. Their novels eloquently depict the brutal atrocities and savagery of the Pakistani invaders and their local collaborators upon the innocent Bengalis during the liberation war period, and at the same time, their novels reflect the shattered dreams, intense despair, helplessness, devastation, and destruction in the newly independent Bangladesh, as well as the vivid consciousness of the freedom fighters and the glorious spirit of the liberation war also imply a poignant portrayal of humiliation. There is no doubt that the

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 139 - 151
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

novels 'Antargata' (1984), 'Jiban o Rajnoitik Bastabata' (1994) and 'Nirapotta Hoi' (1992) have undoubtedly contributed significantly to the stream of Bangla literature with their poignant portrayal of the post-liberation era, blood-soaked times, and the inner and outer turmoil of life, as well as numerous contextual and associative creations.

Discussion

এক

স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই বাঙালির চেতনান্তর থেকে ক্রমশ বিলীন হতে থাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ও সংগ্রামী ইতিহাস; ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে স্বাধীনতার সামূহিক চেতনা ও মূল্যবোধ এবং সমাজের সর্বস্তরে দেখা দেয় ভাঙন। ফলে সমাজমানসে তীব্র হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়, অসঙ্গতি, নৈরাজ্য এবং তারুণ্যের অবক্ষয়, পতন, পচন ও বিনষ্টি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ সম্প্রদায়ের বিপুল অংশ কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে আশা ও স্বপ্নভঙ্গের নিগূঢ় যন্ত্রণায় রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত সেইসব তরুণেরা হয়ে উঠলো দারুণ হতাশাবাদী। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকর্তৃক ধর্ষিত, লাঞ্ছিত অসংখ্য নারী ও গৃহহারা জনতার জন্যে নিরাপত্তা ও স্বস্তির সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যর্থ হলো অনেকাংশেই। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের গণতন্ত্রায়ন ও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা এবং বহুভুজ সংকট ও জটিলতা সমাজজীবনের সম্মুখগতিকে করলো মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত। উপরন্তু, মুক্তিযোদ্ধাদের পরাজয়ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি মধ্যবিত্ত-মানস এবং যুবসমাজের হার্দিক রক্তক্ষরণকে করলো আরও দীর্ঘতর। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কালোবাজারি আর দুর্ভিক্ষের করাল আঘাতে সমাজসত্যের গভীরে যে ভাঙন সূচিত হলো, তা থেকে আত্মস্থ হয়ে জেগে উঠবার আগেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড, স্বৈরসেনাতন্ত্রের ক্ষমতা গ্রহণ এবং একাত্তরের পরিত্যক্ত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের পুনরুজ্জীবন ও স্বাধীনতা-বিরোধী দালাল মৌলবাদী অপশক্তির পুনরুত্থানে সমগ্র বাঙালি সমাজমানস নিক্ষিপ্ত হল এক গভীরতর অন্ধকারে। বিনষ্ট মূল্যবোধ, অবরুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, যুবসম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান হতাশা এবং ব্যবহৃত তারুণ্যের অস্ত্র ও সন্ত্রাস স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকেই করে তুললো সংকটাপন্ন।[১] ফলে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রবল আবেগ স্থিত হয়ে স্বচ্ছ সুগভীর কোনো নির্দিষ্ট জীবন-দর্শনে উপনীত হবার পূর্বেই বাংলা কথাসাহিত্য, বিশেষত বাংলাদেশের উপন্যাস মোড় ফেরালো এক বিপরীতমুখি বোধের দিকে।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিপ্রতীপ সময়পুঞ্জে সামাজিক-রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক উত্তেজনা, তিরিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধ ও সংবিধানের ক্রম-অপসারণ, রক্তপাত ও ষড়যন্ত্রে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অস্থির ও জটিল রূপ এবং ব্যক্তিজীবনের বৈষয়িক, মানসিক ও শারীরিক অব্যবস্থা একজন সাধারণ বাঙালির মতো আমাদের ঔপন্যাসিকদের সংবেদনশীল মানসকেও আলোড়িত করে প্রবলভাবে। তাই অনিবার্যভাবেই এই মানস-আলোড়নের রক্তাক্ত অনুভূতিপুঞ্জই মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে রচিত তাঁদের উপন্যাসমালায় বিধৃত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

> "৭২-এর সূচনাপর্ব থেকেই ফ্রাস্ট্রেশানের সরীসৃপ ধীরে ধীরে পেঁচিয়ে ধরতে থাকে বাংলাদেশের মানচিত্রটিকে। জনজীবনের ন্যূনতম তৈজস থেকে শুরু করে কবিতার শব্দ, প্রতীকময় গোটা শরীর শুঁয়োপোকার গরলে বিবর্ণ হয়ে যায়। অনভ্যস্ত ও অসংগঠিত প্রশাসন এবং তার বিপরীতে অনিয়ন্ত্রিত দুর্নীতি স্বাধীনতার ফলটিকে রাতারাতি বিস্বাদ করে তোলে। মুষ্টিমেয় লুম্পেন সুবিধাবাদীচক্র, উচ্চাভিলাষী আমলাতন্ত্র এবং ক্ষমতালোভী ফড়িয়া রাজনীতিকরা স্বাধীনতা নামক গন্ধম ফলটিকে ভাগেযোগে আত্মসাৎ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। বাংলার গণমানুষের দু'চোখের উপর বাদুড়ের কালো ডানা সেঁটে বসে। সেই অদ্ভুত আঁধারে... প্রতিবাদ কি ছিল না? ছিল, তবে ব্যাপক কণ্ঠে নয়। সাহিত্যিকদের সংবেদনশীল হৃদয় থেকে নিঃশব্দে রক্তক্ষরণ ঘটে যেতে থাকে।"[২]

তবে একথাও স্মর্তব্য, 'যুদ্ধোত্তর সময়ে সর্বব্যাপী হতাশা, নির্বেদ ও বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পীমানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্যে সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানসভূমি'[৩] - ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)-এর 'অন্তর্গত' (১৯৮৪), শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮)-এর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' (১৯৯৪) এবং ইমদাদুল হক মিলন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 139 - 151
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(জন্ম. ১৯৫৫)-এর 'নিরাপত্তা হই' (১৯৯২) উপন্যাসত্রয়ীতে এ-জাতীয় অভিজ্ঞান মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে রচিত কথাসাহিত্যের আশাব্যঞ্জক দিক, সন্দেহ নেই।

দুই

সৈয়দ শামসুল হকের 'অন্তর্গত' (১৯৮৪) উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের ধারায় এক অনবদ্য ও প্রাতিস্বিক সংযোজন। এই উপন্যাসের কাব্যময় বিন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সামূহিক অবক্ষয়, মুক্তিযোদ্ধাদের নির্জিত বিপন্ন ও বিধ্বস্ত জীবন, তাদের পরাভব ও চোরাবালি-প্রতিম জীবনের নির্মম, নিষ্ঠুর বাস্তবতা এবং সময়ের বিবর্তনে ক্রমাগত নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার সীমাহীন মর্মযাতনা। বস্তুত কাব্যিক অবয়বে ও স্বগতকথনের ভঙ্গিতে রচিত এই উপন্যাসটিতে সৈয়দ শামসুল হক বাঙালি জাতিসত্তার সর্বগ্রাসী ক্রন্দন, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম-আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষাকেই ব্যক্ত করেছেন মূলত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের পরিণাম দর্শনে যে মর্মদাহকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাই আমরা, তা স্বাধীনতা-উত্তরকালীন বিপর্যস্ত সময় ও দ্বন্দ্বজটিল সমাজসত্যের নির্ভুল সাক্ষ্য ধারণ করেই হয়ে উঠেছে গভীরতলবিহারী ও তাৎপর্যপূর্ণ।[৪] বলা যেতে পারে, ঔপন্যাসিক তাঁর এই 'উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে বিকশিত করেছেন ভবিষ্যতে কি ঘটবে, বা ঘটতে যাচ্ছে, তার অন্তর্লোকের ভাবনাগুলোকে বাস্তবতার অস্তিত্বের তাৎপর্যদানে।'[৫] উপন্যাসের 'নিবেদন' অংশে ঔপন্যাসিকের সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসার স্বরূপ সংযমের শৃঙ্খল অতিক্রম করে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিক ভাষ্যে -

> "স্মরণ হবে যে উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেছিল। এবং স্মরণ হবে যে, সেই একদা তিরিশ লক্ষ মানুষ বুলেটে প্রাণ দিয়েছিল, দশ লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়েছিল, এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ করেছিল ও আরো এক কোটি মানুষ দেশের ভেতরেই ক্রমাগত ঠিকানা পরিবর্তন করে চলেছিল। হয়ত স্মরণ হবে, আমাদের ভেতরে সেদিন এমন একটি চেতনা এসেছিল, ইতিহাসের করতল ছিল যার উৎস।
>
> আজ কোথায় সেই করতল? কোথায় সেই চেতনা? কোথায় সেই ক্রন্দন? কোথায় সেই ক্রোধ? কোথায় এখন আমরা? এবং কোথায় এখন এই দেশ?"[৬]

'অন্তর্গত' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন। আকবর একাত্তরে গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। শুদ্ধ স্বপ্ন, ক্রোধ এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয় সে। তার বীরত্বে জলেশ্বরী গ্রাম থেকে মান্দারবাড়ি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই হানাদারমুক্ত হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে তার অবিস্মরণীয় অবদানের কাহিনি এ-অঞ্চলের লোকজনের মুখে-মুখে, প্রতিটি ঘরে-ঘরে, আনাচে-কানাচে 'মৌমাছির মতো ওড়ে'। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আকবর হোসেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ঢাকা থেকে আগত কতিপয় সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জনৈক তরুণের উচ্ছ্বসিত কাব্যিক-ভাষ্যে অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধা আকবর যেন এক গভীর ও সত্যময় দীপ্তি নিয়ে বিচ্ছুরিত হয় -

> "মিলিটারির ভয়ে মান্দারবাড়ি থেকে সবাই চলে যাবার পর
> যখন আর কেউ এ মুখো হতে সাহস পায়নি,
> তখন আকবর একা অমাবস্যা রাতে
> খেত মাঠ ভেঙে, গোক্ষুর সাপের পরোয়া না করে...
> মান্দারবাড়ি ঢুকতেই দেখবেন এক বিরাট অশ্বত্থ গাছ,
> সেই গাছের ওপর উঠে-
> ডালপালার ভেতর লুকিয়ে থাকে সে তিন দিন তিন রাত,
> অশ্বত্থ গাছের পাতা হয়ে যায় সে;
> তার গায়ের রঙ অশ্বত্থের মতো সবুজ হলুদ হয়ে যায়।
> গাছের ফেটে যাওয়া বাকলের ভেতরে জিভ ঢুকিয়ে
> সে গাছের রস পান করে তৃষ্ণা মেটায়, আর

অপেক্ষা করে, আর অপেক্ষায় সে থাকে।...
তার অপেক্ষা ক্রমে ক্রমে আজরাইলের কালো কালো অনুচরে পরিণত হয়।...
দেখা যায় অশ্বত্থের নিচে দু'জন হানাদার সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে,
প্রবল দুপুরের রৌদ্র প্রবাহের ভেতরে মানুষের- যারা জীবিত, যারা মৃত-
সমস্ত মানুষের ঘৃণা একটি বিপুল ধ্বংস হয়ে নিঃশব্দে খসে পড়ে;
অশ্বত্থ গাছের পাতা থেকে বিশাল এক বাদুরে রূপান্তরিত হয়ে আকবর
তার তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে শত্রুর দু'টি দেহ-
তার হাতের চাপে মোমের মতো বেঁকে যায় বন্দুকের নল,
পায়ের চাপে মাটির ভেতর পুঁতে যায় তাদের মাথা।"[৭]

কিন্তু সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সর্বস্তরে মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা এবং যুদ্ধ-অর্জিত যাবতীয় শুভ ও সদর্থক মূল্যবোধসমূহের ক্রমবিলুপ্তি মুক্তিযুদ্ধের শুদ্ধচেতনায় বিশ্বাসী অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধা আকবরকে এখন স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণায় পীড়িত ও রক্তাক্ত করে; স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্র জয়িষ্ণু স্বার্থপর, ভেকধারী ভণ্ড-প্রতারক, মাতাল, তস্কর তার সংবেদনশীল মানসচৈতন্যকে করে যন্ত্রণাদগ্ধ, ক্ষত-বিক্ষত। মুক্তিযোদ্ধা আকবরের অতৃপ্ত মানস-ভাবনাস্রোত, তার কল্পনা ও স্মৃতিময়তা এক বেদনাঘন হার্দিক ও নাড়িছেঁড়া অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে ওঠে যেন -

"নয় বছরের যুদ্ধ
আমরা নয় মাসে শেষ করেছিলাম বলেই
বড় সুলভ হয়ে গিয়েছিল সব।
করতাম ন'টি বৎসর ধরে যুদ্ধ,
ঘুরে বেড়াতাম ন'টি বৎসর ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে,
হত্যা করতে পারতাম একটি একটি করে সব শত্রু,
দখল করতে পারতাম ইঞ্চি ইঞ্চি করে সম্পূর্ণ মাটি
তাহলে-
সেই ঘাম, সেই রক্ত, সেই আগুন থেকে-
আমরা নতুন হয়ে বেরুতে পারতাম।"[৮]

সৈয়দ শামসুল হকের 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' (১৯৮৪)[৯] উপন্যাসের নায়ক শিক্ষক তাহেরউদ্দিন খন্দকার এবং মুক্তিযুদ্ধে গেরিলাযোদ্ধাদের নেতৃত্বদানকারী তরুণ ক্যাপ্টেন মাজহারের মতো এই উপন্যাসের নায়ক আকবরও মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের বিপন্ন, বিপর্যস্ত পরিস্থিতি অবলোকন করে 'এ-সত্যে আত্মস্থ হয় যে, মুক্তিসংগ্রাম একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে যায়নি, কারণ সমাজে এখনো আছে অশুভ শক্তির পাঁয়তারা'।[১০] তাই সে পুনরায় আরেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সহযোদ্ধা বাবুলকে বলে- 'আয় বাবুল, আবার আমরা বন্দুক হাতে নেই তবে।'[১১] কিন্তু আত্মসুখসন্ধানী, চরম স্বার্থপর বাবুল সুবিধাসৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এখন অনেকটাই অগ্রসর। এই সুযোগে একাত্তরের পরাজিত অশুভ অপশক্তির পুনরুত্থান ঘটে এবং আকবরের ছোটবোন টুনিকে তারা ধর্ষণের পর হত্যা করে। সমষ্টিগতভাবে পুনরুজ্জীবিত এই অপশক্তির বিরুদ্ধে জ্বলে উঠতে না পারলেও সে এককভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিশোধস্পৃহায় শাণিত হয়ে তার বোনের হন্তারককে হত্যা করে। পরিণামে এক সময়ের দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের ফাঁসি হয়ে যায়। এক সর্বগ্রাসী হতাশা-রিক্ততার মধ্যেও ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক সূক্ষ্ম আশাবাদে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন -

"তবু স্মৃতি বিনষ্ট অথবা নিঃশেষে ধৌত নয়। রমণীর গর্ভ বন্ধ্যা নয়।
পুরুষের বীর্য ব্যর্থ নয়। গ্রন্থগুলো দগ্ধ নয়। প্রতিভা অন্তর্হিত নয়।
মানুষ সেই লুণ্ঠিত জনপদেই স্মৃতিবীজের বাগান আবার করে।"[১২]

ঔপন্যাসিক জানেন, দুঃসময়ে মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা এবং স্বদেশের মুক্তির জন্য নিবেদিত প্রাণ বাংলার স্বর্ণসন্তান মুক্তিযোদ্ধারা বিস্মৃত হলেও কিছু মানুষ আকবর হোসেনের মতো হীরকখণ্ডকে বুকের গভীরে লালন করে থাকে সযত্নে, আজীবন -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 139 - 151
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আকবর হোসেনের কথা শেষ হয়ে যায় না। মানুষের চোখ কেবল কাঁদে না, মানুষের চোখ দেখেও যায়। মানুষেরই চোখ কেবল একসঙ্গে আজ এবং আগামী দেখতে পায়, তাই মানুষের দেখাও কখনো শেষ হয় না। কারণ আগামী তো সবসময় আসবারই প্রতীক্ষায়।"[১৩]

-অতএব একাত্তরের অসমসাহসী 'মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের বীরত্বগাথা সমাপ্ত হয় না, গণ-মানুষের মনের গভীরে তা অন্তর্গত হয়ে থাকে।'[১৪] শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'অন্তর্গত' উপন্যাসের শব্দস্রোতে অন্তঃশীলা শক্তির মতো ক্রিয়াশীল থেকেছে মুক্তিযুদ্ধের অনিঃশেষ চেতনা। এ-উপন্যাসের -

> "পরতে পরতে মিশে আছে অশ্রু আর শোণিত, ঘর্ম আর মাটির গন্ধ, হৃদয়ের স্পন্দন, জীবনের উষ্ণতা। গোটা একটা জাতির বেদনা-সংগ্রাম স্বপ্ন-ব্যর্থতার কাহিনি ছিলাটানা ধনুকের মতো অব্যর্থ গতিতে ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত। রক্তের টান, নাড়ীর টান এখানে মিশেছে তীব্র গভীর দেশপ্রেম আর আত্মত্যাগের প্রবাহে, যাতে চোখ ভিজে আসে, চোখ ভেসে যায়।"[১৫]

বলতে দ্বিধা নেই, 'অন্তর্গত' উপন্যাসের ঘটনাবৃত্ত নির্মাণে এবং চরিত্রায়ণ-পদ্ধতি ও চরিত্র-পরিকল্পনার নেপথ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের মুক্তিযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সমাজসংলগ্নতা, মেধাবী পর্যবেক্ষণদৃষ্টি ও মানববীক্ষণশক্তি। তাই সঙ্গতকারণেই বাঙালির চেতনা-উৎসারিত দীর্ঘশ্বাস ও আত্মক্রন্দনের অন্তর্ময় শব্দস্রোত এই উপন্যাসের কাহিনিকে করেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা-উপঘটনা, চরিত্রমালার স্মৃতিগুচ্ছ, সিনেমাটিক পদ্ধতিতে সম্মুখচিত্রের ব্যবহার কৌশল 'অন্তর্গত' উপন্যাসটিকে সাফল্যমণ্ডিত শিল্পকর্মে উন্নীত করেছে, সন্দেহ নেই তাতে।

তিন

একাত্তর সালের বাংলাদেশের সমাজগতির অন্তর্সত্য ও বহির্সত্য, প্রতিরুদ্ধ বিপ্রতীপ সময়, পাকিস্তানি সামরিক শাসনের হিংস্র তর্জনি এবং স্বাধীনতা-বিরোধী মৌলবাদী অপশক্তির তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে বিপন্ন, ক্ষতবিক্ষত ও বিধ্বস্ত জনজীবনের প্রকৃত সত্যস্বরূপ বিধৃত হয়েছে শহীদুল জহির-এর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' (১৯৯৪) উপন্যাসে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের আবেগ, উত্তাপ, ব্যক্তিসত্তার বহুমাত্রিক সংকট, ঔপনিবেশিক শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন ও অত্যাচারে রক্তাক্ত জাতিসত্তার মুক্তিকামী চেতনার অঙ্গীকার, সমকালীন সময় ও সমাজসত্যের দ্বন্দ্বময় গতিপ্রকৃতি, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সূচিমুখ তীব্রতা এবং সর্বোপরি মহান ও গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের অন্তঃশীলা তরঙ্গকে সামূহিক জীবনবাস্তবতার পটভূমিতে বিন্যস্ত করবার ক্ষেত্রে এই উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী অন্যান্য উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। প্যারাবিহীন টানা গদ্য আর সাবলীল ভাষায় রচিত এ উপন্যাসটিতে একটির পর একটি ছবি উঠে এসেছে; এবং প্রত্যেকটি ছবিই বীভৎস, হৃদয়ভেদী ও মর্মবিদারক। বিভিন্ন এর চরিত্র; ততোধিক বৈচিত্র্যময় চরিত্রের তৎপরতা। বদরুদ্দিন মওলানা এবং আবদুল মজিদ নামের দু'টি প্রধান চরিত্র আছে 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসে। এদের একজন পাকিস্তানের পরম মিত্র দালাল রাজাকার, অন্যজন নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারানো পরিবারের সদস্য। মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট ঘৃণ্যতম পশুদের নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা কতটা ভয়াবহ ও মর্মান্তিক ছিলো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয়টি মাসে, তার যথার্থ প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসের বদরুদ্দিন ওরফে বদু মওলানা চরিত্রটির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। পুরনো ঢাকার বাসিন্দা রাজাকার ও দেশদ্রোহী বদু মওলানাকে স্বাধীনতার পর মানুষ মনে রেখেছে এভাবে -

> "লক্ষ্মীবাজারের লোকদের মনে পড়ে একাত্তর সনে বদু মওলানা নরম করে হাসতো আর বিকেলে কাক ওড়াতো মহল্লার আকাশে। এক থালা মাংস নিয়ে ছাতে উঠে যেত বদু মওলানা আর তার ছেলেরা। মহল্লায় তখনো যারা ছিল, তারা বলেছিল বদু মওলানা প্রত্যেকদিন যে মাংসের টুকরোগুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিতো, সেগুলো ছিল মানুষের মাংস। কারণ মহল্লার সবচাইতে প্রাচীন মুসলমান পরিবারটির প্রধান খাজা আহমেদ আলী বলেছিলেন যে, একদিন এক টুকরো ছুঁড়ে দেয়া মাংস কাকেরা ধরতে ব্যর্থ হলে সেটা এসে পড়েছিল তাঁর বাড়ির ছাতের ওপর।... তিনি কিছুক্ষণ দেখে অনুধাবন করেন যে, টুকরোটির গায়ের একদিকে চামড়া রয়ে গেছে এবং তিনি দেখেন যে এই চামড়া একেবারে মসৃণ।... সেটার গায়ে ছোট্ট মসুরের ডালের মতো একটি পাথরের ফুল। তিনি হাহাকার করে ওঠেন, দু'হাতের অঞ্জলিতে টুকরোটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বড় ছেলে খাজা শফিকের সহায়তায় সেটা দাফন করেন নিজের বাড়ির আঙিনায়। তারপর মাগরিবের নামাজ পড়ার সময় তিনি ফুঁপিয়ে

> ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। একটি অদেখা মেয়ের জন্য লক্ষ্মীবাজারের এক বিষণ্ণ বৃদ্ধের হৃদয় সেদিন ভেঙে পড়ে। এখন তাঁর বাসার আঙিনায় তাঁর নিজের আর তাঁর বড় ছেলের জোড়া কবর।
> অন্য একটি টুকরো, সেটা ছিল পায়ের বুড়ো আঙুলের, পেয়েছিল এক অচেনা পথিক, রাস্তার ধারে ফুটপাতের ওপর। আবু করিমের বড় ছেলে সেটা দেখেছিল।... আঙুলটির নখ খুব বড় ও শক্ত ছিল এবং নখের ওপর ঘন ও মোটা লোম ছিল। নখে লাগানো ছিল টকটকে লাল নখরঞ্জক।... সবাই ভেবেছিল সেটা একজন হিজড়ের হবে। আঙুলের এই কাটা টুকরোটির কি হয়েছিল কেউ জানে না; কিন্তু আবু করিমের বড় ছেলেটি রায়সা বাজারের দোকান থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়।
> অন্য আর একটি টুকরো পড়েছিল জমির ব্যাপারির বাড়ির কুয়োতলায়, বিকেলে ভাতের চাল ধোয়ার সময়, হাড়ির ভেতর। এটা ছিল একটি কাটা পুরুষাঙ্গ। হাড়ির ভেতর এসে পড়তেই জমির ব্যাপারির কিশোরী কন্যাটি চমকে উঠেছিল, কিন্তু হাড়ির ভেতর থেকে বের করে এনে সে বস্তুটি চিনতে পারে নাই। সে সেটা তার মায়ের কাছে নিয়ে গেলে ব্যাপারির স্ত্রী অভিজ্ঞতার কারণে জিনিসটা চিনতে পারে। কাটা লিঙ্গটি খাতনা করানো, মুণ্ডিত।... এরপর জমির ব্যাপারি ন্যাকড়ায় জড়ানো অঙ্গটি সে রাতেই বদু মওলানার বাসায় গিয়ে দিয়ে আসে। এসবই মহল্লার লোক বিস্তারিত জানতে পারে।"[১৬]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটি কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেলেও একাত্তর-পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা-বিরোধী অপশক্তি রাজাকার-আলবদর-আলশামসদের নির্মমতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার প্রকৃত সত্যচিত্র পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে এটির প্রাসঙ্গিকতা কম নয়। কারণ এটিই ছিলো সেই উত্তাল, রক্তাক্ত সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতা। এভাবেই দেশদ্রোহী রাজাকাররা পাকিস্তানি মিলিটারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে অসংখ্য অসহায় মানুষ একাত্তরে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রাণ আর এক সমুদ্র রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বহুমূল্যবান স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর? কি হলো তারপর? তারপর বদু মওলানা অন্যান্য সব রাজাকারের মতোই স্বাধীনতার পর পলাতক জীবনযাপন করে এবং তারও কিছুকাল পরে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে সে পুনরায় তার মহল্লায় ফিরে আসে সদর্পে এবং কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে।

মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে একজন রাজাকারের উত্থান-পতন ও পুনরুত্থান এই বদু মওলানার চরিত্রের মধ্য দিয়ে বীভৎস ভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসে, যা বাংলাদেশের এই বর্তমান সংকটময় সমাজ-পরিস্থিতিতে একটি নির্মম ও নিষ্ঠুর রাজনৈতিক বাস্তবতারূপে বিবেচনাযোগ্য। আবার অন্যদিকে এই রাজনৈতিক বাস্তবতায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারানো পরিবারের নরনারীর যাপিত জীবনের স্বরূপটি কেমন? স্বাধীনতার কয়েক বছর পরে কোনো একদিন পুরনো ঢাকার নবাবপুরে অবস্থিত লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনে হাঁটার সময় এই উপন্যাসের প্রতিবাদী নারী চরিত্র মোমেনার ভাই আবদুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেলে তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় এবং সে শুনতে পায় একাত্তরের ঘাতক বদু মওলানার পুত্র আবুল খায়েরের উঁচু গলার বক্তৃতা; আগের দিন স্বৈরাচার-বিরোধী হরতাল সফল হওয়ার কারণে সে জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে আবদুল মজিদের তখন মনে হয় শুধু স্যান্ডেল নয়, স্যান্ডেলের সাথে সাথে তার আত্মার বন্ধনই ছিঁড়ে গেছে যেন।

মূলত এভাবেই একাত্তরের বর্ণচোরা রাজাকাররা এই স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু স্বজন আর সর্বস্ব হারানো মানুষেরা কী করে ভুলবে সেই রক্তাক্ত কালো অধ্যায়! তাই তারা আর্তনাদ করে : 'এই দ্যাশের মাইনষেরে এ্যালায় বদু মওলানার পোলায় কয়, ভাইছাব। কয়, আপনেগো ধন্যবাদ।'[১৭] তারও আগে 'মৃত খাজা আহমেদ আলী এবং খাজা শফিকের বিধবা স্ত্রীরা, আলাউদ্দীনের মা, পুত্রহারা আবু করিম এবং আরও তিনজন পুরুষ ও রমণী সেই শীতের মঙ্গলবারে তাদের বাড়ির প্রাঙ্গনের ভেতর বদু মওলানাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে;'[১৮] এবং তারপর 'তসবির মালা ঝোলানো জয়নব বেগমকে দেখে মনে হয়েছিল যেন সে তার প্রাঙ্গনে আবাবিলের পুনঃপ্রবেশ রোধ করতে চাচ্ছিলো এবং তার চোখের আগুন দেখে বদু মওলানা একটিও কথা না বলে সেই উঠোন ছেড়ে একটি অপচ্ছায়ার মতো দ্রুত অপসৃত হয়েছিল।'[১৯] এভাবেই মহল্লার প্রতিটি শহিদ পরিবার তাদের উঠোন থেকে 'অপচ্ছায়া' বদু মওলানাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্রমালা ভিন্ন; এখানে বদু মওলানারা আবার সাহস সঞ্চয় করে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 139 - 151
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসে শহীদুল জহির মুক্তিযুদ্ধের সময় মোমেনা নামক একটি নারীকে দিয়ে মহল্লায় প্রথম প্রতিবাদের সূচনা করেন। রাজাকাররা যখন তুলসীগাছ কাটাকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীবাজারের একটি মহল্লায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটায়, তখন ওদের বাড়ির আঙিনায় একজন রাজাকারকে রান্নাঘর থেকে ধারালো কাটারি নিয়ে তাড়া করে মোমেনা। 'পরিণতিতে মহল্লার সব পুরুষ এতে অংশ নেয়' এবং একজন রাজাকারকে চড় মারে। ফলস্বরূপ বদু মওলানা মহল্লায় কয়েকজন পাকিস্তানি মিলিটারি ও তাদের একজন অফিসারকে ডেকে আনে। মহল্লায় পাকিস্তানি মিলিটারির আগমনকে ঔপন্যাসিক রূপকায়িত করেন মহল্লাবাসীদের মানসিক অস্তিত্বের সমান্তরালে -

> "তারা আজীবন যে দৃশ্য দেখে কিছু বোঝে নাই- যেখানে একটি মোরগ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় মুরগিকে- মহল্লায় মিলিটারি আসার পর তাদের মনে হয়েছিলো যে, প্রাঙ্গনের মুরগির মতো তাদের মা এবং কিশোরী কন্যাটি, পরিচিত ভালোবাসার স্ত্রী তাদের চোখের সামনে প্রাণভয়ে এবং অনভিপ্রেত সহবাস এড়ানোর জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটি এমন মর্মান্তিকভাবে তাদের জানা থাকে যে, তাদের বিষণ্ণতা ছাড়া আর কোনো বোধ হয় না। তাদের বিষণ্ন লাগে, কারণ তাদের মনে হয় যে একমাত্র মুরগির ভয় থাকে বলাৎকারের স্বীকার হওয়ার, আর ছিল গুহাচারী আদিম মানবীর।"[২০]

-এই রকম অসংখ্য রূপকায়িত চিত্রমালার মাধ্যমে ব্যক্তিমানসের অস্তিত্বসংকটের সত্যস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসটির পরতে পরতে। সে যাই হোক, বদু মওলানার মুখে সব শুনে পাকিস্তানি লেফটেন্যান্ট প্রথমে মন্তব্য করে- 'কেয়া আপ আওরাতকা সাত নেহি সাকতা?' তারপর বলে- 'লেটস্ সি দি হিরোইন ফার্স্ট।' কিন্তু অফিসারটির সে সাধ পূর্ণ হয়নি। রাজাকাররা মোমেনাকে কোথাও খুঁজে পায়নি আর; ওর মা ওকে ছাই চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পাঁচদিন পূর্বে, ডিসেম্বরের দশ তারিখ দুপুরে রাজাকাররা মোমেনার খোঁজ পেয়ে যায়। সে সময় তাদের হাতে ধৃত 'আবদুল মজিদ এসে যখন তার বোনের হাত চেপে ধরে', তখন মোমেনা ভাইকে আশ্বাস দেয়- 'ডরাইস না, আমারে কিছু করব না।' এরপর আবদুল মজিদের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে সে রাজাকারদের সঙ্গে চলে যায়, কিন্তু আর ফেরে না। দেশ স্বাধীন হলে আবদুল মজিদ তার প্রাণপ্রিয় বোন মোমেনার ক্ষতবিক্ষত লাশ খুঁজে পায় রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। কী অবস্থায় ছিলো মোমেনা তখন? ঔপন্যাসিক শহীদুল জহিরের হৃদয়দ্রাবী বর্ণনা -

> "রায়ের বাজারের জনমানবহীন কুমোরপাড়ার ভেতর দিয়ে সে যখন গিয়ে একটি উঁচু ডাঙার প্রান্তে দাঁড়ায়, সে দেখে বালুচরের মতো কিছু শুকনো মাঠ এবং কিছু জলাভূমি ধার ঘেঁষে পড়ে আছে; আর দূরে রোদের আলোয় চিকচিক করছে বিশীর্ণ নদীর জল। এই বালুচরের মতো একটি মাঠে সে মোমেনাকে পড়ে থাকতে দেখতে পেয়েছিল। এই দূরত্বটুকু সে পার হয়ে এসেছিলো, অথবা বলা যায়, সে এখন বলে যে, এই দূরত্বটুকু পার করে এনে ঈশ্বর তাকে তার মৃত বোনের পাশটিতে স্থাপন করে দেয়। সে তখন তার বোনকে দেখে। তার একটি স্তন কেটে ফেলা, পেট থেকে ঊরু পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, ডান ঊরু কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত চিরে তরমুজের মতো হাঁ করে রাখা। সে চিৎ হয়ে শুয়েছিল, তার পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দু'টো দেহের নিচে চাপা পড়ে ছিলো; মুখটা ছিল আকাশের দিকে উত্থিত।"[২১]

-এই ছিলো আমাদের যাপিত জীবনে একাত্তর। বড়ো বেশি নিষ্ঠুর, বড়ো বেশি নির্মম, বড়ো বেশি হৃদয়ের কাছের, স্মৃতিতে অক্ষয়, অম্লান। কিন্তু সবটাই ক্ষত নয়, সবটাই বেদনা নয়। ছোট্ট একটি চরিত্র মোমেনা 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসে; কিন্তু ঔপন্যাসিক এই সামান্য চরিত্রকেই করে তুলেছেন অসামান্য। মূলত গোটা বাঙালি জাতির মানসচিত্রকে বিধৃত করেছেন তিনি এই মোমেনা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। সে যে একজন সামান্য নারী - এই বোধে মোমেনা আক্রান্ত হয়নি কখনোই; বরং ধারালো দা হাতে রাজাকারকে তাড়া করেছে, দেশদ্রোহীদের হাতে ধৃত হবার পর ভাই মজিদকে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছে- 'ডরাইস না'। তার ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত নিথর দেহ যখন আবিষ্কৃত হয় বধ্যভূমিতে, তখন মোমেনা পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের সাহসী চেতনার অনিবার্য প্রতীকরূপে স্ব-চিহ্নিত হয়ে যায়। এই সাহস নিয়েই মুক্তিযোদ্ধারা ঘর ছেড়ে, একান্ত স্বজন ছেড়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নির্দ্বিধায়; এই সাহসের জন্যেই বাংলাদেশের স্বর্ণসন্তান বুদ্ধিজীবীদের বধ্যভূমি রচিত হয়েছে রায়ের বাজারে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 139 - 151
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বাধীনতার কয়েক বছর পর আবদুল মজিদের একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হলে মজিদ সেই কন্যা শিশুটির নাম রাখে মোমেনা। 'আবদুল মজিদ বহু বছর পরে যখন তার মেয়ের নাম রাখে মোমেনা, সে তা এই কারণে করে না যে, সে মোমেনার নাম ভুলে যাচ্ছে; বরং এই কারণে যে এই নামটি ভুলে যাওয়ার নয়।'[২২] এই নামটি রাখবার পর কী কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো মহল্লাবাসীর মনে, সেটি আবদুল মজিদ জানতে পারে না; কিন্তু প্রবল বিস্ময়ের সঙ্গে সে লক্ষ করে 'একাত্তর সনের স্মৃতি সব চাইতে বেশি মনে রয়ে গেছে বদু মওলানার।'[২৩] কারণ সে একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবদুল মজিদকে বলে- 'বইনের নামে নাম রাকচো, বইনরে ভুলো নাইক্যা?... বদু মওলানার কথা শুনে তার যা মনে হয় তা হল এই যে, বদু মওলানা জানে আবদুল মজিদরা একাত্তরের নয় মাসের কথা ভোলে নাই।'[২৪] 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসে কাহিনির এ-পর্যায়ে একটি চরমতম সত্য উচ্চারণ করেছেন ঔপন্যাসিক। তিনি বলেছেন যে, স্বাধীনতা-বিরোধী ঘাতকদের উত্থানের এই রাজনৈতিক বাস্তবতা চলমান থাকলে মোমেনা নামধারী শিশু কন্যাটিকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে যাবে। এই অনিবার্য কারণেই তাই আবদুল মজিদ -

> "চায় না তার মেয়েটি তার বোনের মতো বদু মওলানা কিংবা তার ছেলেদের জিঘাংসার শিকার হোক এবং তার মনে হয়, বাস্তবতা এভাবে এগোলে এরকম যে ঘটবে না, তা কেউ বলতে পারে না। তার মনে হয়, বদু মওলানা একাত্তর সনের সেই একই রাজনীতির চর্চা করে এবং সে এখনো জানে আবদুল মজিদ এবং তার পরিবার মোমেনার মৃত্যুর জন্য এখনো তাকে ঘৃণা করে। তার মনে হয়, এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় বদু মওলানা এবং তার দল সুবিধে করতে পারলে তারা আবদুল মজিদকে ছেড়ে দেবে না এই ঘৃণার জন্য।"[২৫]

তাই আবদুল মজিদ তার লক্ষ্মীবাজারের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে তার প্রাণপ্রতিম কন্যাটিকে নিয়ে এদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। সে জানে, মেয়েটি বেঁচে থাকলে বেঁচে থাকবে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ মোমেনার স্মৃতি, বেঁচে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা, এই স্বাধীন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব। আর এভাবেই ঔপন্যাসিক শহীদুল জহিরের আত্মগত চেতনা জাগ্রত থাকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি অবলোকনে। তিনি যেন কিছুতেই এর বাইরে থাকতে পারেন না; আমাদের পট্টি লাগানো দুই চোখে আঙুল দিয়ে তাই তিনি দেখিয়ে দেন সমাজসত্যের দুষ্টক্ষত আর বীভৎস রূপ, আমাদের অস্তিত্বমূলে তীক্ষ্ণ আঘাত করেন এই প্রশ্নবাণে- যারা ক্ষমতায় থাকবেন তাঁদের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য ভালো-মন্দের বোধটি তুলে নেওয়া নয় কী? এই প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' নামক এই শিল্পকর্মটিকে একই সঙ্গে করে তোলেন শিল্প-সফলও; সেখানে ভিন্নতর কিছুর সঙ্গে তাঁর কোনো আপোস নেই যেন। বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত ধারায় 'মুক্তিযুদ্ধের লোকায়ত দ্রোহের তীক্ষ্ণ চিৎকার হয়ে থাকবে এ-উপন্যাসটি',[২৬] সন্দেহ নেই তাতে।

চার

বহুমাত্রিক সামাজিক সংকট ও অসঙ্গতিই একজন সংবেদনশীল ব্যক্তিকে করে দেয় নিরবলম্ব, নিঃসঙ্গ; কখনো সমাজ তাকে ধ্বংস করে, আবার কখনো কখনো আত্মাহুতি দেয় মানুষ তার স্বনির্মিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেই। বহির্জগৎ-বিচ্ছিন্ন আত্মকৃত ভূগোলের মধ্যে বসবাসরত এই ব্যক্তিমানুষের আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান, আত্মদহন, আত্মহনন ও আত্মখননের প্রকৃত স্বরূপসন্ধানে কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলনের সাফল্য সন্দেহাতীত। স্বাধীনতা-উত্তর সময় প্রবাহে অন্ধকারমুখী সমাজচৈতন্যের জটিল, দ্বন্দ্বময় ও রক্তাক্ত স্বভাবলক্ষণ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে তাঁর সংবেদনময় সৃজনশীল শিল্পীমানস। তাই সঙ্গতকারণেই মুক্তিযুদ্ধজনিত রক্তক্ষরণ এবং যুদ্ধোত্তর স্বপ্নভঙ্গের ট্র্যাজিক বেদনাবোধ তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেরই মৌল উপজীব্য।

মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালীন বিপন্ন ও বিপর্যস্ত বর্তমান এবং সম্ভাবনাশূন্য ভবিষ্যতের পদমূলে অপেক্ষমাণ যুবসম্প্রদায়ের বহুবর্ণিল যন্ত্রণাদীর্ণ মানসরূপ ইমদাদুল হক মিলনের 'নিরাপত্তা হই' (১৯৯২) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। নায়ক মন্টুর আত্মসংকটের সমান্তরালে সমষ্টির সত্তাসংকটের সুনিপুণ অন্তর্বয়নে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসটির চেতনাজগৎ। মুক্তিযোদ্ধা মন্টুর ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সমগ্র দর্পণে ঔপন্যাসিক অঙ্কন করেছেন সমাজসত্তার মস্তিষ্ককোষের পচন, পতন ও বিনষ্টির ভয়ঙ্কর, মর্মন্তুদ চিত্রমালা। সঙ্গতকারণেই তাই 'নিরাপত্তা হই' উপন্যাসের পরতে পরতে আমরা দেখতে পাই, এটির অতি সংবেদনশীল চরিত্র-পাত্ররা পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করেও মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালের সামূহিক স্বপ্নভঙ্গ, ব্যর্থতা ও

নৈঃসঙ্গ্যবোধে বিপন্ন, হার্দিক দ্বন্দ্বময়তার টানাপোড়েনে অন্তর্জগতে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, শতদীর্ণ। ঔপন্যাসিকের অন্তরঙ্গ অবলোকনশক্তির প্রাখর্যে এই উপন্যাসে যাপিত জীবনের যে সত্যস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে, সেখানে মানবীয় সংকটের শেকড় অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সীমা অপেক্ষা আরো অনেক গভীরে প্রোথিত।

'নিরাপত্তা হই' উপন্যাসের নায়ক মুক্তিযোদ্ধা মন্টু চুয়াত্তর সালের এক সকালে ঘুম থেকে উঠে ছোটো বোন মিনির কাছে জানতে পারে ঘরে এক দানা খাবার নেই। চার মাসের বাড়ি ভারা বাকি পড়েছে। দু'দিন যাবত বাড়িতে কোনো রান্না হয় না। মা জায়নামাজে বসে কাঁদেন। মন্টু এসবের কিছুই জানতো না। তার সহযোদ্ধারা সবাই আজ অসৎ পথে অর্থশালী হচ্ছে তরতর করে; অথচ সে সৎ থেকে উপোস করছে। দেখেশুনে মন্টুর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়; প্রবল আলোড়ন ওঠে তার সুপ্ত চেতনাজগতে -

> "একদিন অস্ত্র হাতে প্রতিজ্ঞা করেছিল, দেশ স্বাধীন করবে। করেছে। আজ কেন যেন মনে হয় সেই অস্ত্র ধরেই সংসারের চেহারাটা পাল্টাতে হবে। ... হঠাৎ শরীরের ভেতর রক্ত লাফালাফি শুরু করে মন্টুর। ... অস্ত্র নিয়ে আমি কখনো কোনো অন্যায় করিনি। আমার বন্ধুরা অস্ত্রবাজি করে জীবন পাল্টিয়েছে। জিল্লু বিরাট ফার্ম খুলেছে মতিঝিলে। এয়ার কন্ডিশন্ড অফিস, টয়োটা গাড়ি, লাখ লাখ টাকা। জাহিদ-কায়সাররা নেতাদের ধরে ডিলারশিপ, পারমিট এসব করিয়েছে। শালাদের চেহারায় চেকনাই ঝলমল করে আজকাল। আমি কোন লোম ফেলেছি! অনেস্টি দিয়ে কিচ্ছু হয় না। দেশ ভালোবাসি, কিন্তু দেশ আমাকে কিছু দেয়নি। না খেয়ে আমার বোনের চোখে কালি পড়ে, অসহায় মা জায়নামাজে বসে কাঁদে! আমি আর পারি না! তিন বছর অপেক্ষা করেছি। আর কতকাল! আর কেন?"[২৭]

-প্রতিকারহীন, প্রতিরোধহীন, সীমাহীন সর্বপ্লাবী শূন্যতার মধ্যে একাত্তরের অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধা মন্টু জিজ্ঞাসায়, বেদনায়, হার্দিক রক্তক্ষরণে আর্তনাদ করে ওঠে। আকস্মিকভাবে অস্ত্র 'শব্দটা মনে পড়তেই মাথায় টুংটাং করে একটা মিউজিক বাজে মন্টুর। একটা রিভলবার এখনো আছে। কুয়োতলার পেছন দিকে, ময়লা ফেলার জায়গায় মাটির নিচে। পলিথিন কাগজে প্যাকেট করে ভেতরে খড়কুটো, একটা রিভলবার আর কিছু গুলি রেখে দিয়েছে মন্টু। ওই একটা অস্ত্রই জমা দেয়া হয়নি। বাহাত্তরে মনে হয়েছিল, কি জানি কখন আবার দরকার হবে। কিছু জাঁদরেল রাজাকার, শান্তিবাহিনীর লোক থেকে গেল। রাতারাতি গজিয়েছে সিক্সটিন ডিভিশন। হাইজ্যাক ফাইজ্যাক করছে। এই শালাদের জন্যে অস্ত্র আবার দরকার হবে'[২৮]। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে অবশেষে কুয়োতলা থেকে রিভলবারটা তুলে আনে সে। অস্ত্রটা হাতে নেয়ার পর তার মনে হয় অনেককাল ঘুমিয়েছে সে, আজই প্রথম জেগে উঠলো। তার ভেতরে যেন লাফিয়ে উঠলো হঠাৎ 'আশিটা রয়েল বেঙ্গল'। অতঃপর অস্ত্র হাতে সে বেরোয় বন্ধু ও সহযোদ্ধা রাজার খোঁজে। এই রাজা মুক্তিযুদ্ধের সময় -

> "মন্টুদের মধ্যে সব চাইতে ফেরোসাস যোদ্ধা ছিল। গোয়ালীমান্দ্রার ফাইটে গুলি করতে করতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। ডান কাঁধের একটু নিচ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। এক খাবলা মাংস উড়ে গেল। এখনো ভালো একটা গর্ত হয়ে আছে। স্বাধীনতার ওটুকু চিহ্নই রাজা এখনো বয়ে বেড়ায়"।[২৯]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে একাত্তরের এই দুঃসাহসী বীর-সৈনিকের যাপিত জীবনের চিত্রটি কেমন? মন্টুর অভিজ্ঞতাসূত্রে ঔপন্যাসিক উন্মোচন করেন এক দর্শনহীন, মীমাংসাহীন ও যন্ত্রণাদগ্ধ সময়প্রবাহে ব্যক্তিজীবনের এক নির্মম, নিষ্ঠুর বাস্তবতা -

> "জ্যোৎস্না রাত হলে জমে। বোতল নিয়ে মাদুরের ওপর বসে যায় রাজা। হাতে সিগ্রেট থাকবেই। শালা খুব মুডি পোলা। পয়সা না থাকলে যাত্রাবাড়ির মোড় থেকে তিন-চার টাকার গাঁজা কিনে স্টার সিগ্রেটের সুকা বের করে খুব মনোযোগ দিয়ে তার ভেতর ভরে। তারপর রাতভর টানে আর গিটার বাজায়।... কখনো কখনো তিন-চার মাস শেভ করে না। আর দুনিয়ার অলস শালা, দেড়তলা থেকে নামতে চায় না। যুদ্ধটা শেষ হওয়ার পর পরই ফ্লপ মেরে গেল। অথচ যুদ্ধের সময় রাজার স্পিডের কোনো তুলনা ছিলো না।"[৩০]

সামাজিক অচলায়তনবন্দি, বহির্জীবনে নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্তর্জীবনে সক্রিয় রাজার মতো এই সব অসংখ্য চরিত্র যুদ্ধোত্তরকালের বিচিত্র অসঙ্গতিতে পূর্ণ সমাজ-কাঠামোরই অনিবার্য সৃষ্টি। এরা তাদের অন্তর্জীবনের সক্রিয়তায়, হতাশায়, ব্যর্থতায়, নৈঃসঙ্গ্যে 'নিরাপত্তা হই' উপন্যাসে নির্মাণ করেছে এক বেদনাদীর্ণ ভূখণ্ড। নিজ জন্মভূমে আউটসাইডার হয়ে যাওয়া

এই চরিত্রপুঞ্জের দীর্ণ জীবনানুভবের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে যুদ্ধক্ষত সময় ও সমাজের এক নিঃস্ব, রিক্ত ও সম্ভাবনাহীন ভবিষ্যতের সত্যস্বরূপ -

> "মন্টুকে দেখেই গিটারটা নামিয়ে রাখে রাজা। 'আহো দোস্ত।'...
> মন্টু কথা বলে না। রাজার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মন্টুর চোখের দিকে তাকিয়ে রাজা কি একটু চমকে ওঠে! বললো, 'কি বে?'
> মন্টু বললো, 'কাল রাতের খেলা শেষ হয় নি?'
> 'আবে না। চলুক না।'
> 'না, আর চলবে না। আজ থেকে জুয়া বন্ধ।'
> 'কি কচ?'... শুনে রাজা একটু দাঁত কেলিয়ে হাসে- 'আবে জুয়ার নাল না তুললে তুই চলবি কেমনে?'
> এবার চেঁচিয়ে ওঠে মন্টু, 'জুয়ার নাল তোলার জন্যে যুদ্ধ করেছিলাম? দেশ স্বাধীন করেছিলাম শালা?'
> শুনে রাজা বড় করে সিগ্রেটে একটা টান দেয়। তারপর আবার সেই হাসি- 'কি বে, নাট-বল্টু ঢিলা অইয়া গেছে নি? যুদ্ধ করছচ, দেশ স্বাধীন করছচ ঐডি অহনও মনে রাখছচ! ভুইলা যা, বেবাক ভুইলা যা দোস্ত। স্বাধীনতা আমাগো কোনো কামে লাগে নাই। যাগো লাগনের, তাগো লাগছে। মাল খা, জুয়া খেল আর মেজাজ খারাপ থাকলে দোতারা বাজা। ঐডাই ভালা।... দেশের খবর রাইখা আমার কি অইবো? অই, দেশ আমার লেইগা কি করছে বে?"[৩১]

-যুদ্ধোত্তর বিপন্ন ও বিপর্যস্ত ব্যক্তিমানসের, বিশেষত তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের উন্মূলিত, নিঃসঙ্গ ও দিশেহারা জীবনের এই সর্বব্যাপ্ত হতাশা ও পরাভবচেতনা 'নিরাপত্তা হই' উপন্যাসের বিষয়ভাবনার কেন্দ্রমূলে স্থাপিত হয়েছে। এ-উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনা, উপঘটনা, চরিত্র, চরিত্র-অন্তর্মুখ যন্ত্রণা ও চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের আত্মদর্পণের প্রতিসরণ। ফলে, সঙ্গতকারণেই তিনি অবলোকন করেছেন যুদ্ধোত্তর সময়, সমাজ ও তার ক্ষতদীর্ণ চেতনাপ্রবাহকে; এবং একই সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজের সর্বস্তরে আপোসকামিতা, বিকার ও পলায়নপরতা। তবে নায়ক মন্টু 'নিরাপত্তা হই' উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল, ব্যতিক্রমী চরিত্র। এ-চরিত্রটির আচার-আচরণ, উচ্চারণ ও তৎপরতার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের এক সার্বজনীন আদর্শ-রূপ সন্ধান করেছেন এবং সমকালীন অন্তর্মুখী, নৈরাশ্যমগ্ন ও আত্মবিনাশী সমাজ ও রাজনৈতিক স্রোতাবর্তকে দিয়েছেন আলোকোজ্জ্বল উত্তরণের দিক্-নির্দেশনা। তাই, সমগ্র উপন্যাসের কোথাও আমরা দেখি না - একদিন যে মন্টু মা-বোনের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য, সংসারে একটু সুখ-শান্তি আনবার জন্য জেদের বশে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলো হাতে, সেই মন্টু তার পথভ্রষ্ট সহযোদ্ধাদের মতো মুক্তিযুদ্ধ-অর্জিত মূল্যবোধ, বিবেক আর মনুষ্যত্বকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে; বরং আমরা প্রত্যক্ষ করি সমগ্র উপন্যাস জুড়েই উৎকীর্ণ হয়ে আছে তার প্রখর দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তার সযত্ন প্রচেষ্টা, বহুমূল্যে অর্জিত স্বাধীনতার অনির্বাণ চেতনাকে চির প্রজ্জ্বলিত রাখবার দৃঢ় প্রত্যয় এবং স্বাধীনতার সোনালি ফসলকে পুঁজি করে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা সুবিধাবাদী, আত্মসুখসন্ধানী ও স্বার্থান্বেষীচক্রের সমাজ-বিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিবাদ আর অসহায় নরনারীর জন্য তার প্রগাঢ় মমত্ববোধ। এ-প্রসঙ্গে 'নিরাপত্তা হই' উপন্যাস থেকে স্ফটিকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, দ্যুতিময় কয়েকটি এলাকা -

> [**ক**] "মন্টু একটু সরে গিয়ে নিজেকে সেভ করে, তারপর আস্তে করে তলপেটের কাছ থেকে পাঞ্জাবিটা একটু তোলে- 'এটা চিনস? ছ'টা গুলি ভরা আছে। পাঞ্জাবির দু'পকেটও ভর্তি। স্বাধীনতার পর বহুৎ রংবাজি করছস তোরা। কিছু বলি নি, সয়ে গেছি সব। আজ থেকে আর কিছু দেখতে চাই না।' তারপর আঙুল তুলে মন্টু বললো, 'একটা একটা করে লাশ ফেলে দেব।"[৩২]
>
> [**খ**] "রিকশা নারিন্দার মোড়ে আসতেই মন্টু দেখে... লোকজনের মাঝখানে পাঞ্জাবি-পাজামা আর চাদর কাঁধে বাচ্চু ভাই।... বিশাল ভুঁড়ি হয়েছে। গায়ের চর্বি চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।... এম.পি. বানিয়েছিল মন্টুরাই চেষ্টা করে। কিন্তু এম.পি. হয়েই শালা চেহারা সুরত পাল্টে ফেলেছে।... বাচ্চু ভাই বিগলিত হেসে বললেন, 'কি খবর মন্টু মিয়া, কেমুন আছো?' মন্টু ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি এম.পি. হওয়ার পর আপনি কখনো খবর নিয়েছেন?... দেশের যে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা বেকার হয়ে আছে, তাদের জন্যে কি করেছেন আপনারা?...

দেশটা উজার করে ফেলেছেন আপনারা, আপনাদের মতো কয়েকটি শুয়োরের বাচ্চা। নিজেদের পেট মোটা করছেন। নামে বেনামে হাজারো রকমের ব্যবসা একেকজনের। ডিলার, পারমিট। গাড়ি ছাড়া চলতে পারেন না। চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে প্রতিদিন। লবণের সের ষোল টাকা। দেশের অসহায় যুবতী মেয়েরা সব বেশ্যা হয়ে যাচ্ছে পেটের দায়ে। এজন্যে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম? দেশ স্বাধীন করেছিলাম? কি রেখেছেন আপনারা দেশটার ! মাত্র তিন বছরে সব হজম করে ফেললেন?... গত বছর একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখি ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান এক জাঁদরেল দালাল। স্বাধীনতার পর আমরা কয়েকজন ওই শুয়োরের বাচ্চাকে অনেক খুঁজেছি। শালা গা ঢাকা দিয়েছিলো। পাই নি।... মুক্তিযুদ্ধে আপনাদের মতো লোকজন মরে নি, মরেছে বাংলার দীন-দরিদ্র মানুষ। নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত লোক।... দেশটা লুটেপুটে খাচ্ছেন আপনারা।”[৩৩]

[গ] “আশিটা রয়েল বেঙ্গল একসঙ্গে হুংকার দিয়ে ওঠে মন্টুর বুকের ভেতর যেন। লাফ দিয়ে ওঠে মন্টু। কোমর থেকে ঝটকা টানে রিভলবার বের করে চেঁচিয়ে ওঠে, ‘খবরদার কায়সার! ছেড়ে দে ওকে।’ মন্টুর হাতে রিভলবার দেখে জাহিদ-বাবলার হুইস্কির নেশা মুহূর্তে কেটে যায়। দু’জনেই তারপর একসঙ্গে তোতলাতে থাকে- ‘কি কি অ অইছে দোস্ত!’

‘চুপ শুয়োরের বাচ্চা। খুব চান্স নিচ্ছ গ্রামের অনাহারী মেয়েগুলোর ওপর! ফুসলে-ফাসলে বাড়ি এনে এইসব করছো! ম্যালা দেখেছি, আর দেখতে চাই না। হাইজ্যাক-ফাইজ্যাক করে প্রচুর মাল কামিয়েছো, কিছু বলি নি। সব সহ্য করেছি, আর করবো না। সব ভুলে গেছো শালারা! মিলিটারি বাবাদের দাবড়ানি খেয়ে যখন গ্রামে পালিয়েছিলে, তখন এরাই তোমাদের জায়গা দিয়েছিল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তোমাদের জন্য গুড়-মুড়ি আর পানি নিয়ে বসে থাকতো কারা?... নিজেরা না খেয়ে তোমাদের খাইয়েছে। চার বছর কাটলো না, সব ভুলে গেলে!’...

চকির ওপর থেকে টাকাগুলো তুলে পকেটে ভরে মন্টু। তারপর বললো, ‘তোদের মতো শুয়োরের বাচ্চাদের কাছ থেকে এইভাবে এখন থেকে টাকা নেবো আমি। নিয়ে অনাহারী মানুষদের বাঁচাবো। পারলে ঠেকাস মন্টুকে।’

তারপর মেয়েটার হাত ধরে মন্টু- ‘আয় মিনি। ভয় পাসনে। তোর ভাই এখনো জীবিত। যে কোনো বিপদে তোর ভাই তোকে রক্ষা করবে।”[৩৪]

- সদ্যস্বাধীন দেশের সর্বস্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও যুদ্ধ-অর্জিত মূল্যবোধসমূহের ক্রম-বিলুপ্তি মুক্তিযুদ্ধের শুদ্ধচেতনায় বিশ্বাসী এই মন্টুকে স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণায় পীড়িত ও রক্তাক্ত করে; স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্র জয়িষ্ণু স্বার্থপর, ভেকধারী ভণ্ড, প্রতারক, মাতাল, তস্কর তার সংবেদনশীল মানসচৈতন্যকে করে যন্ত্রণাদগ্ধ, ক্ষতবিক্ষত। মন্টুর অতৃপ্ত মানস-ভাবনাস্রোত, তার কল্পনা ও স্মৃতিময়তা এক বেদনাঘন হার্দিক ও নাড়িছেঁড়া অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত, মন্টুর প্রতীকে ক্যান্সার-আক্রান্ত পচনশীল সময় ও সমাজের উত্তরণ-অসম্ভব বাস্তবতায় সর্বব্যাপ্ত নঞর্থকতার মধ্যেও ঔপন্যাসিক অন্বেষণ করেছেন সদর্থক আলোকবিন্দু। যুদ্ধোত্তরকালের অস্তিত্ববিনাশী, সংকটাপন্ন, দ্বন্দ্বজটিল, সংক্ষুব্ধ, রক্তাক্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সময়প্রবাহে ঔপন্যাসিকের এই সত্যানুসন্ধান নিঃসন্দেহে তাঁর ইতিবাচক ও প্রাগ্রসর জীবনচেতনার শিল্পফসল। ব্যক্তিমানসের আত্মখনন, আত্মদহন ও আত্মহননের রক্তাক্ত বলয় হয়তো সমাজসত্যের অনিবার্য নিয়তি; কিন্তু একজন সংবেদনশীল স্বকালঋদ্ধ কথাশিল্পীর প্রাগ্রসর চেতনার দায়বদ্ধতা সেই অনিবার্য নিয়তি-বিধানকেও কীভাবে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে- ইমদাদুল হক মিলনের ‘নিরাপত্তা হই’ উপন্যাসটি তার হীরকোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাঁচ

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিপ্রতীপ জীবন, সময় ও সমাজবাস্তবতার অভিক্ষেপে, মনন ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, মানবমনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটনে এবং নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পপ্রয়োগে সৈয়দ শামসুল হকের ‘অন্তর্গত’, শহীদুল জহিরের ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ এবং ইমদাদুল হক মিলনের ‘নিরাপত্তা হই’ - এই ত্রয়ী উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের ধারায় নিঃসন্দেহে শক্তিশালী ও শ্রমনিষ্ঠ শিল্পকর্ম। তাঁদের এই তিনটি উপন্যাসে যেমন একদিকে রূপায়িত হয়েছে হিংস্র পাকিস্তানি হানাদার আর তাদের এদেশীয় পরম মিত্র একাত্তরের ঘাতক রাজাকার-আলবদর-আলশামশদের নির্বিচারে পীড়ন-নির্যাতন-হত্যাযজ্ঞ এবং তাদের প্রতি সমগ্র বাঙালি জাতির প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা; তেমনি অন্যদিকে শিল্পিত হয়েছে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নভঙ্গের নিগূঢ় যন্ত্রণা, অসীম পরাভব, অস্তিত্বহীনতা, তাদের পরাজয়ক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখচ্ছবি এবং বহুমূল্যে অর্জিত চির-কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার মোহভঙ্গজনিত চরম হতাশা, নির্বেদ ইত্যাদি বহুবর্ণিল প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। স্বাধীনতা-

উত্তরকালের বহমান সময়প্রবাহ, মানবজীবন এবং সমাজের কালিক-অভিজ্ঞতার রূপায়ণে এই উপন্যাসত্রয়ী স্বতন্ত্রমাত্রাস্পর্শী। মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালীন মানবজীবনের বিপন্ন, সঙ্কটদীর্ণ ও রক্তাক্ত সত্যস্বরূপ উন্মোচনে কথাশিল্পীরা তাঁদের এই উপন্যাসগুলোতে গ্রহণ করেছেন বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতি; ফলে চরিত্রায়ণরীতিতে সঙ্গতকারণেই তাই মুখ্য হয়ে উঠেছে ব্যক্তিমানসের তথা চরিত্রসমূহের দৃষ্টিকোণ, অন্তর্ভাবনা, স্বগতকথন ও মনোবিশ্লেষণ। বলাবাহুল্য, ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক, শহীদুল জহির এবং ইমদাদুল হক মিলনের ব্যক্তিচরিত্র পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা মানবজীবন ও মানবসত্তার গভীরতল প্রদেশে সতত ক্রীড়াশীল। এই তীব্র, তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী জীবন এবং সমাজসত্য পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার অনন্য বৈশিষ্ট্যই বাংলা কথাসাহিত্যের সুবিস্তৃত অঙ্গনে তাঁদের সুনির্দিষ্ট আসন চিহ্নিত করেছে।

Reference:

১. খান, রফিকউল্লাহ, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* ১ম সং-১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৬৭
২. সিদ্দিক, আবু বকর, ‘চল্লিশ বছরের কবিতা : বায়ান্ন থেকে বিরানব্বই’, *কবি ও কবিতার সংগ্রাম,* ১ম সং-১৯৯৪, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৫০-৫১
৩. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, ‘বাংলাদেশের উপন্যাস’, *বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ,* ১ম সং-১৯৯৪, সম্পা. করুণাময় গোস্বামী, সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ, পৃ. ২৯৪
৪. খান, রফিকউল্লাহ, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯
৫. সুলতান, আমিনুর রহমান, *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা,* ১ম সং-১৯৯৬, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৬০
৬. হক, সৈয়দ শামসুল, ‘নিবেদন’, *অন্তর্গত,* ২য় সং-১৯৯৫, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা
৭. হক, সৈয়দ শামসুল, *অন্তর্গত,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯
৮. *তদেব,* পৃ. ১২১
৯. হক, সৈয়দ শামসুল, *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী,* ১ম সং-১৯৮৪, সব্যসাচী, ঢাকা
১০. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *বাংলাদেশের সাহিত্য,* ২য় সং-২০০৯, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৩৬
১১. হক, সৈয়দ শামসুল, *অন্তর্গত,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭
১২. *তদেব,* পৃ. ১২৫
১৩. তদেব, পৃ. ১২৭
১৪. পরিমল, রিষিণ, প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস ও অন্যান্য, ১ম সং-২০০৯, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৬১
১৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* ২য় সং-১৯৮৭, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃ. ১২৪
১৬. জহির, শহীদুল, *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা,* ১ম সং-১৯৯৪, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১১-১২
১৭. তদেব, পৃ. ১৫
১৮. তদেব, পৃ. ২১
১৯. তদেব, পৃ. ২৪
২০. তদেব, পৃ. ১৭
২১. তদেব, পৃ. ২৯
২২. তদেব, পৃ. ৩৩
২৩. তদেব, পৃ. ৩৫
২৪. তদেব, পৃ. ৩৬
২৫. তদেব, পৃ. ৩৭

২৬. জাহাঙ্গীর, কামরুজ্জামান, ‘চার উপন্যাসের জহিরকথন’, *হালখাতা,* সম্পা. শওকত হোসেন, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানু-মার্চ ২০১০, ঢাকা, পৃ. ২৭৪
২৭. মিলন, ইমদাদুল হক, *নিরাপত্তা হই,* ১ম সং-১৯৯২, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১১
২৮. তদেব, পৃ. ১৭
২৯. তদেব, পৃ. ২৬
৩০. তদেব, পৃ. ৩৩
৩১. তদেব, পৃ. ৩৭
৩২. তদেব, পৃ. ৩৯
৩৩. তদেব,‘ পৃ. ৪৫
৩৪. তদেব, পৃ. ৪৯

Bibliography:

ক. আলোচিত উপন্যাস :

হক, সৈয়দ শামসুল, অন্তর্গত, ২য় সং-১৯৯৫, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা
জহির, শহীদুল, জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, ১ম সং-১৯৯৪, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা
মিলন, ইমদাদুল হক, নিরাপত্তা হই, ১ম সং-১৯৯২, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা

খ. সহায়ক গ্রন্থ :

আল আজাদ, আলাউদ্দিন, সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু, ১ম সং-১৯৭৪, মুক্তধারা, ঢাকা
কায়সার, শান্তনু, বাংলা কথাসাহিত্য : ভিন্নমাত্রা, ১ম সং-২০০১, ঐতিহ্য, ঢাকা
খান, রফিকউল্লাহ, বাংলাদেশের উপন্যাস, বিষয় ও শিল্পরূপ, ১ম সং-১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। গোস্বামী, করুণাময় (স.), বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ, ১ম সং-১৯৯৪, সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ
ঘোষ, বিশ্বজিৎ, বাংলাদেশের সাহিত্য, ২য় সং-২০০৯, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা
পাঠক, অতীন্দ্রিয়, প্রবন্ধ সংকলন : বিষয় উপন্যাস, ১ম সং-১৯৯৯, প্রতিভাস, কলকাতা
মিরবর, কল্যাণ, বাংলাদেশের উপন্যাস : চার দশক, ১ম সং-১৯৯২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
মাহমুদ, অনীক, সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ, ১ম সং-১৯৯৯, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা
মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ২য় সং-১৯৮৭, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা
মোঃ সাইফুজ্জামান, গাজী, বাংলাদেশের উপন্যাসে ভূমি ও মানুষ, ১ম সং-২০১০, মনন প্রকাশ, ঢাকা
শিকদার, আবদুল হাই, বাংলা সাহিত্য : নক্ষত্রের নায়কেরা, ১ম সং-২০০৪, হাতেখড়ি, ঢাকা
হোসেন, শওকত (স.), হালখাতা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, ঢাকা